রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাদম্বরী
পরিশিষ্ট

ভূমিকাঃ আমার এই লেখাটি প্রকাশের পর আমি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ব্যাক্তিগত কিছু ইমেইল পেয়েছি। লেখা নিয়ে আমি ব্যাক্তিগত ইমেইল পাওয়ার চেয়ে ফোরামে বা ওয়েবেই পাঠকদের মতামত জানতে আগ্রহী থাকি বলে, আমি আমার লেখায় আমার ব্যাক্তিগত ইমেইল এ্যাড্রেসটি ব্যাবহার করি না। প্রকাশিত লেখা নিয়ে কোন মন্তব্য থাকলে আমি মনে করি সেটা জানার অধিকার সব পাঠকদেরই আছে বা থাকা উচিত। কিছু কিছু ইমেইল ছিল লেখাটির প্রশংসা করে আর কিছু ছিল বিরক্তি প্রকাশ করে। কেউ কেউ রেফারেন্সগুলো চেয়ে পাঠিয়েছেন আবার কেউ নিজের কাছে থাকা রেফারেন্স, লেখা আমাকে পাঠিয়েছেন। যারা প্রশংসা করেছেন কিংবা যারা বিরক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, কষ্ট করে আমার লেখাটি মনোযোগ ও আন্তরিকতা নিয়ে পড়ার জন্য। সবিনয়ে সামান্য নিবেদন এই যে, অন্য সব ভেতো বাঙ্গালীদের মতো ঠাকুর বাড়ির জীবন যাত্রা নিয়ে আমারও কৌতুহলের সীমা নেই। আজ এতো বছর পর কবিগুরুকে এই ব্যাপার নিয়ে আমার মতো অভাজনের ডিফেন্ড করার কিছুই নেই। তিনি তার কর্মের জন্যই মহান হয়ে আছেন আর যতোদিন বাংলা ভাষা থাকবে এই পৃথিবীতে, তিনি স্বমহিমায় তার স্থানে থাকবেন। আর কাদম্বরী দেবীর কাছে সারা বাংগালী জাতীর মতো আমিও ঋনী যিনি এই মহান সৃষ্টির প্রেরনা হিসেবে রয়েছেন। এই পরিশিষ্টটি লেখার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। যারা ইমেইল পাঠিয়েছেন তাদের জন্যই এই পরিশিষ্টটির অবতারনা।

কাদম্বরী যখন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন তখন ফুলতলির ভবতারিনী মাত্র বালিকা মাত্র।
কাদম্বরীকে তথা নতুন বৌঠানকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা অসংখ্য গান, কবিতার কারনে অনেকের মাঝেই একটা কৌতুহল কাজ করে, তাহলে কবিগুরু আর কবিপত্নীর মাঝে সম্পর্ক কেমন ছিল? কবিগুরু কি তাহলে তার স্ত্রীকে সবসময় অবহেলা করে গেছেন? সেই সব কৌতুহল মেটাতেই এই লেখাটির অবতারনা।

ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী বেনীমাধব রায়ের বড় মেয়ে ভবতারিনীর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হলো রবীন্দ্রনাথের। গুরুজনরা তার জন্য যে সম্পর্ক ঠিক

করেছিলেন রবি বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিয়েছিলেন। বিয়ে করতে তিনি অন্য কোথাও যাননি, জোড়াসাকোর বাড়িতেই বিয়ে হয় তার। বেশী জাক জমকের বিয়ে তার হয়নি। পারিবারিক বেনারসী "দৌড়দার" আর জমকালো শাল গায় দিয়ে তিনি বিয়ে করতে গেলেন নিজেদের বাড়ির পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে। বিয়ে করে আনলেন জগত সম্পর্কে অজ্ঞ বালিকা ভবতারিনীকে। কবির বাসরের সুন্দর বর্ননা আছে হেমলতার খাতায়, বাসরে বসেই কবি দুষ্টুমী আরম্ভ করে দিলেন, ভাড় খেলার বদলে তিনি সব ভাড়গুলোকে উলটে পালটে দিচ্ছিলেন। তাতে তার ছোট কাকিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, তোর বাসরে কে আর গান গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে, তুই একটা গান ধর। তখন তিনি ওড়নাঢাকা জড়সড় বধূর দিকে তাকিয়ে কৌতুকভরে গান ধরেছিলেন, আ মরি লাস্যমইয়ী ....। গানটি তার ন'দিদি স্বর্নকুমারীর লেখা।

কবি মনে হয় তার এই অসম বিয়েতে আনন্দেই ছিলেন, অন্তত ছোট ছোট ঘটনা গুলোতে তাই মনে হয়। প্রথমে মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুরবাড়ির আদব - কায়দা, রীতি নীতির ঘরোয়া তালিম নিতে গেলেন মৃনালীনি গেলেন নীপময়ীর কাছে, তারপর নীপময়ীর মেয়েদের সাথে তিনি লোরেটো হাউসে পড়তে গেলেন। মতান্তরে তিনি আধুনিকতার তালিম নিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে। লোরেটো হাউসে তাকে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে না পড়িয়ে আলাদা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলের ইংরেজী শিক্ষা, পিয়ানো শিক্ষা, সংগীতের শিক্ষা, সংস্কৃতের শিক্ষা তাকে অতি আধুনিকাও করেনি আবার কোন সৃষ্টিশীল কাজেও লাগেনি। সংসারের মাঝে তারপর আস্তে আস্তে ভবতারিনী একদিন মৃনালিনীর মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তার এই পরিবর্তন পৃথিবীর কোথাও কোন আলোড়ন তুলল না বটে কিন্তু আপনজনদের কাছে করে তুলল তাকে অসামান্যা। চারপাশে অতি সোচ্চার ও সরব লোকজনের মাঝে তার নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ ভূমিকাটি সবার মন ছুয়ে গেলো। তিনিও এই বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতো অভিনয় করেছেন, রামায়ন অনুবাদ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রূপকথা সংগ্রহ করে তার কিছু অংশ নিজে লিখেছেন। মৃনালিনী মুখে মুখে গল্প বলার বেশ ভালো একটা কায়দা জানতেন। ছোটবেলায় মায়ের মুখের গল্প বলার ধরন মীরার মনে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। আনন্দে, সুখে, শোকে, দুঃখে, বিপদে সবার পাশে থেকেছেন। এতো সব গুনে গুনান্বিতা হওয়ার পর কেমন কেটে ছিল রবীন্দ্রনাথ আর মৃনালিনীর যুগল জীবন?

অনেকের মতে কবিগুরু তার স্ত্রীর পিতৃপ্রদত্ত নামটি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। হ্যা সেটা হয়তো সত্যিই তাই যে নামটি তিনিই পছন্দ

করেছিলেন, কিন্তু সেসময় ঠাকুরবাড়ির প্রায় সমস্ত বউদের জন্যই এই রীতি প্রযোজ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ আলাদা কিছুই করেননি। শোনা যায় কথায় যশুরে টান থাকায় মৃনালিনী প্রথমে কিছুদিন কথাই বলেননি। সেই তিনিই অচিরে রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রানী' নাটকে "নারায়নী" সেজে মেজো ভাশুর সত্যেন্দ্রনাথের বিপরীতে নজরকাড়া অভিনয় করেছিলেন। ঘরোয়া অভিনয় নয়, বেশ বড় মাপের আয়োজন হয়েছিল। পরে অবশ্য "সখিসমিতি"র দু- একটা নাটকে অভিনয়, কিংবা "মায়ার খেলা"র ছোট খাটো চরিত্রে অভিনয় করা ছাড়া তাকে কিছুতেই অংশগ্রহন করতে দেখা যায় নি। স্বামীর আগ্রহের মর্যাদা দিতেই তার এসমস্ত কর্মকান্ডে জড়ানো। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে এসব ব্যাপারে মৃনালিনীর নিজে অংশগ্রহন করার কোন আগ্রহই ছিল না। তিনি ভালোবাসতেন রান্না - বান্না, সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকতে।

কবি ছিলেন সৌখীন মানুষ। খাবার দাবারের ব্যাপারেও তার প্রচন্ড শখ কাজ করতো। জোড়াসাকোতে যেদিন ঘরোয়া আসর বসত সেদিন কবি তাকে ফরমায়েশ করতেন, মামুলী কোন খাবার যেনো মেন্যুতে না থাকে, সবই হতে হবে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ন। সেই সময়ের সকলেই কবি পত্নীর রন্ধনপটুতার কথা স্বীকার করতেন। স্ত্রীর রান্নার পারদর্শিতায় উৎফুল্ল হয়ে কবি প্রায়ই সব উদ্ভট রেসিপি এনে এক্সপেরিমেন্ট করতেন, যা শেষে মৃনালিনীকেই সামলাতে হতো। পত্নীকে রাগানোর জন্য তিনি বলতেন, "দেখলে তোমার কাজ তোমাকেই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম"। মৃনালিনী চটে গিয়ে বলতেন, "তোমার সঙ্গে পারবে কে? সব ব্যাপারেতো জিতেই আছো। গত হয়ে যাওয়ার পরে তিনি পুত্রবধূ প্রতিমার সাথে গল্প করে বলতেন,"তোমার শাশুড়িকে আমি কতো রান্না শিখিয়েছিলাম"। প্রতিমা বলতেন, "কিন্তু তিনিতো ভালো রাধিয়ে ছিলেন বলে শুনেছি।" কবি হেসে বলতেন, "তিনি ভালো রাধিয়ে ছিলেন বলেই, আমার মেনুগুলো সব উতরে যেতো"।

কবির নির্দেশে রামায়নের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি। শেষ করে যেতে পারেননি। অন্য একটি খাতা পাওয়া গিয়েছিল রথীন্দ্রের কাছে যাতে, তিনি মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা, উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেন। কবির নির্দেশে এগুলো ছাড়াও তিনি বাংলার রূপকথা সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তার খাতা থেকেই "ক্ষীরের পুতুল" গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন। মৃনালিনী ঠিক যেভাবে গল্পটি বলেছিলেন, তেমনি হুবহু লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এই রূপকথার জাদুকরের হাতেখড়ি হয়েছিল মৃনালিনীর

কাছে। তিনি প্রচন্ড আমোদপ্রিয় ছিলেন। তার পরিহাসপ্রিয় মনটির খোজ পেতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে তার লেখা চিঠিগুলোর কাছে। কিছু কিছু চিঠি এমনিই ভাষার অলংকরনে বাধানো যে সাহিত্যকেও হার মানায়। কিছু চিঠি সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালা যত্ন করে রেখেছিলেন।

সহধর্মিনীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা কি ছিল??? একথা জানতে হলে মৃনালিনীকে লেখা কিছু চিঠির আশ্রয় আমাদেরকে নিতে হবে। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে “ভাই ছুটি” সম্বোধন করতেন। “তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকলভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভালো হতো। তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে, কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে, আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ন মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুতখুত না করে ভালোবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর, আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।“

কবির আশা পূরন করেছিলেন মৃনালিনী। জীবনের সবক্ষেত্রে তিনি স্বামীর পাশে থেকেছেন। এমনকি কোলকাতার ঠাকুরবাড়ির আরাম আয়েশ ছেড়ে কবির সাথে তিনি শান্তিনিকেতনে যেতেও পিছপা হননি। এইধরনের কান্ডজ্ঞানহীন অসাংসারিক কাজের জন্য আত্মীয় স্বজনদের বিদ্রূপ, উপহাস সবই তিনি সহ্য করেছেন কিন্তু স্বামীর পাশ থেকে সরেননি। পাশে থেকে শুধু মানসিকভাবেই নয়, নিজের সমস্ত গয়নাও হাসিমুখে কবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কাজের জন্য। নিজেও আশ্রমের বিভিন্ন অংশের কাজের দেখাশোনা করতেন তিনি তারমধ্যে ব্রক্ষচর্য আর ছোট শিশুদের বিভাগ ছিল তার নিয়মিত কাজের তালিকায়। মৃনালিনী আরো কিছুদিন বেচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আরো সার্থক হতে পারতো। “চারিত্রপূজা” গ্রন্থের এক জায়গায় কবি লিখেছেন, “মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরে নানা কার্যে এবং জীবন বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস, তাহার স্বামীর কার্যে রচিত হইয়া থাকে, এবং সে লেখায় তাহার নামোল্লেখ থাকে না”। এরই মধ্যে মৃনালিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনুভব করা যায়। সাধারন ভাবেও বোঝা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে মানসিকভাবে শান্তি ও স্বস্তিতে না থাকলে কবি এতো এতো মূল্যবান লেখা আমাদেরকে উপহার দিতে পারতেন না।
শান্তিনিকেতন স্থাপনের মাত্র এগারো মাসের মাথায়, এই কঠোর পরিশ্রম

সহ্য করতে না পেয়ে মৃনালিনী বিদায় নেন। যাকে “স্বর্ন মৃনালিনী” হওয়ার আর্শীবাদ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

মৃনালিনীকে হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ অকূল পাথারে পরেন। প্রতি পদে তার প্রিয়তমা “ভাই ছুটির” অভাব বোধ করতে থাকেন। তার আশ্রম বিদ্যালয় অসম্পূর্ন থেকে গেছে মৃনালিনীর অভাবে। কবির জীবনের যখন সবচেয়ে কঠিন সময় চলছে তখনই তার পত্নী বিয়োগ হয়। সব কথা খুলে বলা যায় এমন লোকের তখন কবির খুবই অভাব। “স্মরনে” কবিতায় সেই আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে,

“তোমার সংসার মাঝে হায় তোমাহীন
এখনো আসিবে কত সুদিন - দুর্দিন
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস টানে
তোমারে খুজিতে এসে চাব কার পানে??? “

এই লেখাটির জন্য জোড়াসাকো থেকে পৃথিবীর পথে - বাসব ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির কথা - হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল - চিত্রা দেবের বইগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে।

ধন্যবাদ সবাইকে।

তানবীরা তালুকদার
২৫.০৭.০৮